জা ।র্মা ।নি

এয়ারলাইন্সের আত্মকাহিনী

আমার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। সবাই আমাকে আদর করে বিমান নামে ডাকে। আমি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বহন করে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে যাই। প্রতি সপ্তাহে একবার বিজি ০৫৮ নাম নিয়ে ঢাকা থেকে জেদ্দা ও রোম হয়ে জার্মানি ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে যাই। সেখান থেকে যাত্রী নিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে আসি। আমি যখন ঢাকা থেকে যাত্রা করি তখন আমার ডিসি ১০-৩০ নামের ভোমা শরীরটা আকাশে ঠেলে উঠাতে প্রতিবারই বিলম্ব হয়ে যায়। ছোটখাটো বিলম্ব আবার আমি করি না, আমার বিলম্ব মানেই একদিন বা দুই দিন। আমার অনেক যাত্রী বাংলাদেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিমানবন্দরে এসে আমার বিলম্ব দেখে মহাবিপদে পড়ে যায়। ঢাকায় আমার দীর্ঘ বিলম্বের কারণে যাত্রীদের হোটেলে পাঠানোর আন্তর্জাতিক নিয়মের আমি ধার ধারি না। কারণ ঢাকায় তো আমি রাজা। কিন্তু সমস্যা হয় আমি যখন ইউরোপের কোনো দেশের বিমানবন্দরে গিয়ে আমার ভোমা শরীরটা সময়মতো আকাশে উঠাতে ব্যর্থ হই। প্রায়ই আমার ডিসি ১০-৩০ নামের পুরনো মোটা শরীরটা হয় জেদ্দা, না হয় রোম বা ফ্রাঙ্কফুর্টে অবতরণ করার পর বড় ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। ত্রুটি দূর না হওয়া পর্যন্ত আমার আকাশে ওড়ার অনুমতি মেলে না। অর্থাৎ আমি ধাপ্পাস। দেশে থাকলে আমি রাজা, কিন্তু উন্নত দেশে এলে আমার কি যে বেহাল অবস্থা!

শিডিউল, প্ল্যান, টাইমটেবিল ইত্যাদি শব্দ আমি আজকাল আর বুঝি না। কারণ বিদেশের কোনো বন্দরে একবার ধাপ্পাস হলে ১২-১৩ ঘন্টা আগে আর আকাশে উড়তে পারি না। শিডিউল মানবো কীভাবে? আমার শরীরের যন্ত্রাংশ আবার বিদেশে কোথাও পাওয়া যায় না। পাওয়া যাবেই বা কীভাবে? আমার মতো পুরনো বিমান তো এখন আর পৃথিবীর কোথাও নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঢাকা (অনেকে ঠাট্টা করে বলে ঢাকার ধোলাইখাল) থেকে আমার যন্ত্রাংশ আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বিদেশের বিমানবন্দরগুলোতে অসহায়ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এই তো সেদিন রোম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে আর উঠতেই পারলাম না। ইটালির কর্তৃপক্ষ আমার শরীর পরীক্ষা করে তো হতবাক। তারা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারছিল না যে ভয়াবহ রকমের একটি যান্ত্রিক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আমাকে ঢাকা থেকে উড্ডয়নের অনুমতি দেয়া হলো। যাই হোক, রোম থেকে যাত্রী নিয়ে আমি আবার আকাশে উড়ার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু ইটালির কর্তৃপক্ষ মারাত্মক ত্রুটি নিয়ে আমাকে কিছুতেই আকাশে ওড়ার অনুমতি দেবে না। ইটালি কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, আমি নাকি লক্কড় মার্কা বাতিল বিমান, যাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলি। মানুষের জীবনের মূল্য কি ইটালিয়ানরা আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে?

কা ।তা ।র

শিশু জোকি নিষিদ্ধ

কাতার সরকার উট দৌড়ে শিশুদের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ২৯ ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই আইন পাস করা হয়। কাতার ক্যামেল রেইছ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট শেখ হামাদ বিন জাসেম বিন ফয়সলের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় এই আইন পাস করা হয়। তিনি বলেন, বিশ্বের বুকে কাতারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গালফের প্রতিটি দেশের উট দৌড় একটি জনপ্রিয় খেলা। অভিযোগ করা হয় গরিব দেশগুলো থেকে শিশু ছেলেদের প্রতারণা করে এনে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলো অনেকদিন ধরে এই অঞ্চলের দেশগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে। গাল্‌ফ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে কাতারই প্রথম রাষ্ট্র যে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আইন পাস করলো। শেখ হামাদ সাংবাদিকদের বলেন, এতো বছরের মধ্যে উট দৌড়ে উটের জোকিতে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। তবে ছোটখাটো আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে- যা যেকোনো খেলাধুলায় হওয়া স্বাভাবিক। তিনি বলেন, কাতার কখনো স্মাগলিংয়ের মাধ্যমে শিশুদের এনে জোকি হিসেবে ব্যবহার করেননি। বেশির ভাগই সুদান অথবা সোমালিয়ান বাচ্চারা ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বাচ্চাদের পিতারা অর্থের বিনিময়ে তাদের বাচ্চাদের দিয়েছে। এখন থেকে উট দৌড়ের জোকি হিসেবে রোবট ব্যবহৃত হবে। সুইজারল্যান্ড থেকে বিশেষভাবে তৈরি এই রোবট এনে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা হয়েছে। এই বিশেষ টেকনোলজি ব্যবহারের জন্য কাতার অনুমতি লাভ করেছে। নতুন আইনে জোকি হিসেবে মানুষ ব্যবহৃত হলে তার বয়স ১৫ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে এবং ওজন কমপক্ষে ৪০ কেজি হতে হবে। কাতারের এই সিদ্ধান্তকে মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইতিমধ্যে অভিনন্দন জানিয়েছে।

সাঈদুর রহমান কালাম
পোস্ট বক্স নং-৫৭০, দোহা, কাতার

শত অনুরোধেও কাজ হলো না। ততক্ষণে ১২ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। শত শত যাত্রীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে আমার লোকজন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। মারমুখো যাত্রীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে রোম বিমানবন্দর পরিণত হলো ঠিক যেন ঢাকার সদরঘাটে। পরে ইটালীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে বাক্স-পেটরাসহ প্রায় আড়াইশ' যাত্রীকে পাঁচটি বিশাল বাসে করে ভেড়ার পালের মতো হোটেলে এবং সেখান থেকে পরদিন অন্যান্য এয়ারলাইন্সের বিমানে করে তাদের যার যার গন্তব্যে পাঠানো হলো।

প্রায় প্রতিটি ফ্লাইটে গচ্চা দেয়ার পরও আমার কার্যক্রম কিন্তু থেমে নেই। আমার সবচেয়ে বড় সুবিধা, আমার যাত্রীরা বেশির ভাগই দেশপ্রেমী প্রবাসী বাংলাদেশী। আমার ভাড়া অন্য সব এয়ারলাইন্সের চেয়ে অনেক অনেক বেশি এবং আমার সেবার মান সবার চেয়ে অনেক অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও তারা শুধু আমার কাছ থেকেই টিকিট কেটে দেশে যায়। অনেকেই ভাবে, যুগের পর যুগ গচ্চা দিয়েও আমি আসলে টিকে আছি কিভাবে? তাদের অবগতির জন্য আমার টিকে থাকার তিনটি মূল কারণ উল্লেখ করছি এক. প্রবাসী বাংলাদেশী যাত্রীদের আবেগই আমার গচ্চা ব্যবসার পুঁজি। অনেক প্রবাসী আমার ওপর অভিমান করলেও সবাই একবার আমার স্পর্শ পেতে চায়। পেতে চায় মাতৃভূমির মাটির গন্ধ। প্রবাসীরা দেশপ্রেমিক এবং দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে বেশির ভাগ প্রবাসী বাংলাদেশীর প্রথম পছন্দ আমি। আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে, আমি এমন একটি আবেগপূর্ণ জাতির জাতীয় পতাকা বহনকারী বিমান সংস্থা। দুই. আমি বাংলা ভাষায় কথা বলা বিশ্বের একমাত্র এয়ারলাইন্স। একমাত্র আমিই বিমানের দরজায় প্রবাসী যাত্রীদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবহ সুরে বরণ করি। তাছাড়া আমি এমন একটি দেশের মর্যাদার প্রতীক, যে দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলাদেশের কোনো সরকার যদি আমার কার্যক্রম বন্ধ করার ধৃষ্টতা দেখায়, তাহলে সে সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। তিন. একমাত্র আমিই কিছু কিছু ব্যতিক্রমী প্রবাসী বাংলাদেশীর সব ধরনের অত্যাচার সহ্য করি। ইউরোপের কঠিন নিয়মকানুনে অভ্যস্ত কিছু কিছু বাঙালি শুধু বিমানে উঠেই সব নিয়মকাকুন ভুলে যায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে চোখের ইশারায় ৩০ কিলোর জায়গায় পার হয়ে যায় ১০০ কিলো। তাছাড়া প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী যেকোনো বাংলাদেশীর মৃতদেহ একমাত্র আমিই বিনামূল্যে স্বদেশের মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

এতো কিছুর পরও জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট

প্যা ।রি ।স

ইউরোপের সুখ

লোকটির নাম আব্দুর রউফ। আবুধাবীতে এক আরবির বাসায় বাবুর্চির কাজ করতেন। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বাংলাদেশে বউ আর দুই ছেলে আছে। ভাইদের যার যার পৃথক সংসার। মোটামুটি মাসিক বেতন পেয়ে দেশে যা টাকা পাঠাতেন তা দিয়ে বউ-বাচ্চারাও স্বচ্ছলভাবে জীবন কাটিয়ে নিচ্ছিল। অনেক বাঙালি ইউরোপে যাচ্ছে। ইউরোপে কাগজ পেয়ে গেলে বউ বাচ্চাকেও নিজের কাছে নিয়ে আসা যায়। মিডিল ইস্টের চাকরি তো অস্থায়ী। এই ভাবনায় অনেকের মতো আব্দুর রউফও একদিন দালাল ধরে পাড়ি দিলেন ইউরোপের একটা দেশ ফ্রান্সে। ফ্রান্সে যেকোনো লোক এলে এই দেশের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে আদালতের কাছে তাকে কেস করতে হয়, কি সমস্যায় এই দেশে এসেছে তা জানিয়ে। কেস দাখিলের পর পুরো এক বছর ওই ব্যক্তিকে সরকারি ভাতা দেয়া হয়। মোটামুটি ওই টাকা দিয়ে একজন লোক বাসা ভাড়া এবং খাওয়ার খরচ চালিয়ে নিতে পারে। কেউ কেউ ফাঁকে ফাঁকে ফুল, খেলনা ইত্যাদি বিক্রি করে বাড়তি টাকা আয় করে। কেউ কেউ ভাগ্য ভালো থাকলে কাগজ না পেয়েও যেকোনো রেস্টুরেন্টে কাজ পেয়ে যায়। তবে কাজ করতে হয় গোপনে। তারপর একদিন কেসের রায় হয়। কেউ কেস পায়। কেউ প্রথমবার না পেলে আপিল করে। আমি ফ্রান্সে আসার আগে আব্দুর রউফ সাহেব আমাদের বাসায় ভাড়াটে থাকতেন। মুরব্বি প্রকৃতির লোক হওয়ায় আমার স্বামী তাকে মামা ডাকতেন। আমি ফ্রান্সে আসার পর মামা আমাদেরই আশপাশে ব্যাচেলরদের বাসায় চলে যান। রক্ত সম্পর্কের মামা না হলেও সে আমাদের আপনজন। সেই মামা তিনটি বছর হলো এই দেশে এসেছেন। কেস করেছেন। কেস পাননি। আপিল করেও লাভ হচ্ছে না। বয়স্ক লোক বলে কেউ রেস্টুরেন্টে কাজও দেয় না। মাঝে মাঝে খেলনা বিক্রি করেন। কোনো কোনো দিন অল্প বিক্রি হয়। কোনো দিন পুলিশে সব মালামাল নিয়ে যায়। কারণ কাগজ না থাকলে এ দেশে কাজ করার অনুমতি নেই। প্রায় সময় মামা আমাদের বাসায় আসেন। ওনার সুখ-দুঃখের কথা আলাপ করেন। দেশে বউ-বাচ্চার কথা চিন্তা করেন। হঠাৎ সেদিন খবর পেলাম মামা অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মনে করলাম অসুখ কমে যাবে। কিন্তু না, পরে শোনা গেল মামার কঠিন অসুখ হয়ে গেছে। অপারেশন করতে হলো। আমার স্বামী মাঝে মাঝে মামাকে দেখতে যান। আমারও খুব ইচ্ছে হয় কিন্তু ওই হাসপাতালে বাচ্চা নিয়ে যাওয়া নিষেধ। তারপরও একদিন বাচ্চাদের পাশের বাসায় রেখে মামাকে দেখতে গেলাম। হাসপাতালের বেডে মামার কঙ্কালসার দেহ দেখে খুব মায়া হলো। আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'বেশ খাইবার লাগি ইউরোপ আইছলাম তাই আইজ আমার এই দশা। আমি তার বাঁচতাম না। চারদিকে এতো ঋণ শোধ করতে পারলাম না। আমার বউ-বাচ্চাদের কি উপায় অইব?' মামাকে কোনো রকমে সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম এ রকম অনেক বাঙালি মামার মতো ইউরোপ আসে বেশি টাকা রোজগারের আশায়। দেশের মানুষকে সুখী করতে। কিন্তু কয়জন পারে নিজে সুখী হতে?

Shahara Khan, 26 Fernand Pelloutier, 92110-Clichy, Paris, France.

২০০৫
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
INTERNATIONAL Mother Language Day
2005

টোকিওতে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

অনুষ্ঠানমালা : পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী ও উত্তরণের দেশাত্মবোধক গান
দিন : ২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৫, রোববার; **সময় :** সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
অনুষ্ঠানের স্থান : গ্রীন হল (সাবেক সানবুন হল) ৩৬-১, সাকাই-চো, ইতাবাশি-কু, টোকিও
সকল যোগাযাগ : ০৩-৫২৪৮-৩৯৮৮/০৩-৩৯০৯-২২০৭/ ০৯০-৫৫৩৮-৪৮৪২
অনুষ্ঠানে আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত (Tobu-Tojo Line, Oyama Stn. Mita Line-Itabashi Kuyakushomae Stion)

আয়োজনে : পরবাস, জাপানের দ্বিমাসিক পত্রিকা
ই-মেইল : porobash@hotmail.com
হোমপেজ : www.porobash.com

নি ।উ ।জি ।ল্যা ।ন্ড

হ্যামিল্টন লেকে এক বিকেল

আগের রাতে, রাতে দুটোয় আমরা চার গাড়িতে প্রায় আঠারো জন ট্যাম্পেল ভিউ'র (Temple View) ক্রিস্টমাস লাইটিং দেখবো বলে রওনা হয়েছিলাম। রাত ২টায় আমাদের এই বের হওয়ার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল কান্ট্রি সাইডে গিয়ে ভরা জ্যোৎস্নার চাঁদ দেখা। নিস্তব্ধ রাতে কান্ট্রি সাইডে গিয়ে ভরা জ্যোৎস্নার চাঁদ দেখার যে কী এক অপূর্ব অনুভূতি- তা যে না দেখবে সে কখনোই বুঝবে না!

হ্যামিল্টন সিটি বাউন্ডারি থেকে ট্যাম্পেল ভিউর দূরত্ব এগারো কিলোমিটার হলেও কিন্তু আমাদের বাসা থেকে এর দূরত্ব প্রায় সতেরো কিলোমিটার। আমাদের দুর্ভাগ্যই বলা যায়। আমরা সেই সতেরো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গিয়ে দেখলাম ট্যাম্পেল ভিউর ট্যাম্পেলের মেইন গেট বন্ধ। যা আমাদের জানা ছিল না যে, ক্রিস্টমাস টাইমে সিকিউরিটির জন্য ট্যাম্পেলের মেইন গেট বন্ধ হয়ে যায় ১২টায়। আর নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়ার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। এই বৃষ্টি তো এই রোদ, এই ভরা জ্যোৎস্না তো এই কালি মেঘ। এই সতেরো কিলোমিটার পথ আসতে আসতেই চাঁদটা যে কখন ভরাট কালি মেঘের আড়ালে চলে গিয়েছিল- তা খেয়াল করিনি। ততোক্ষণে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি।

সে রাতটাই মাটি।

খারাপ লাগছিল শফিক সাহেবের জন্য। ভদ্রলোক সস্ত্রীক অকল্যান্ড থেকে হ্যামিল্টন বেড়াতে এসেছেন প্রায় সাড়ে তিন বছর পর।

কিন্তু পর দিনটা খারাপ গেলো না। আসিফ সাহেবের বাসায় প'রটা মাংসের সঙ্গে দুপুর পর্যন্ত তুমুল আড্ডায়, টিভিতে ইংলিশ ছবি দেখায় আমরা সবাই কাছাকাছি বয়সের বলে আড্ডা খুব জমে উঠেছিল। দুপুর খানিকটা পড়ে আসতেই আমরা প্রায় ২০ জনে ৫টি গাড়ি নিয়ে বের হলাম। আমার ইচ্ছে ছিল হ্যামিল্টন গার্ডেনে যাওয়া, কিন্তু আসিফ সাহেব অ্যান স্ট্রিটের ওয়াইকাটো রিভার ব্যাংকের প্রস্তাব দিলেন। তাই হলো। সেখানে আমরা একঘন্টা কাটালাম। এক পাড়ে ওয়াইকাটো নদীর খাড়া পাথরের পাড় তো অন্য পাড় শুয়ে রয়েছে পাথর বিছিয়ে দেয়া নদীর সমতলে। বাড়িগুলো যেন ঝুলে রয়েছে নদীর ওপর। সমুদ্র পরিবেষ্টিত দ্বীপ দেশ এই নিউজিল্যান্ড হলেও এ দেশের মানুষের প্রথম ভালোবাসা নদী বা সমুদ্র তীরে একটা সুন্দর বাড়ি। কেউ তা না পারলে তার সেটা আজীবন স্বপ্ন হয়ে থাকে।

সেখান থেকে একটু বিকেল হয়ে আসতেই আমরা রওনা হলাম হ্যামিল্টন লেকের ডাক পার্কে। পৌঁছাতে সত্যিকারের বিকেল হয়ে এলো। ডাক পার্কের পাশে শতবর্ষের পুরনো গাছের ছায়া। হ্যামিল্টন লেকের জলে শত শত হাঁস। আমরা যাকে বলি, গৃহস্থের ঘরের সেই পাতিহাঁস। পাউরটি ছিটিয়ে দিতেই হাঁসগুলো দলে দলে উঠে আসে জল থেকে ডাঙায়। একেবারে হাতের কাছে। কোনো ভয় নেই, কোনো দ্বিধা নেই। আমাদের বাংলাদেশের কোনো লেকে যদি এমন শত শত হাঁস ভাসতো, এক সপ্তাহ কী, পরদিনই সে সব পালকগুলোও খুঁজে পাওয়া যেত না!

আসিফ সাহেবের স্ত্রীর বানানো ডালপুরি, খোলা একাশের নিচে পিকনিকের বাস্কেট, গাছে গাছে শত-সহস্র পাখির কাকলি, নরম রোদ, প্রশান্ত বিকেল এবং লেকের হিন্ হিন্ বাতাস- আমাদের বিকেলটা অতি সাধারণ হয়ে কেমন অসাধারণ হয়ে উঠলো। বিদেশের এতো শত ব্যস্ততার মাঝেও এতোটুকু অবকাশ! আমাদের আরো ভালো লাগছিল, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা যখন ডালপুরি হাতে হাঁসগুলোকে খাওয়ানোর জন্য দৌড়াচ্ছিলো। তখন মনে হচ্ছিল আমাদের বিদেশের এতো কষ্ট, এতো ব্যস্ততা শুধু ওদের জন্যই তো। ওরাই তো আমাদের সমস্ত আশা ও সমস্ত প্রত্যাশা!

মহিবুল আলম, 2/200, Grey St, Hamilton, East, Hamilton, Newzealand

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

- বিভাগীয় সম্পাদক

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

অথবা

email : info@shaptahik2000.com

শহরে আমার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ রয়েছে। এখান থেকে ঢাকায় যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা খুবই নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও এখানে রয়েছে আমার ভাড়া করা একটি বিশাল অফিস। এই অফিসে দেশী-বিদেশী বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও রয়েছে একজন ড্রাইভার। সপ্তাহে মাত্র একবার আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে যাই সামান্য কয়েকজন যাত্রী বহন করার জন্য। অফিসের কর্মচারীরা সারা সপ্তাহ ঘরের বাজার-সদায় করে ঘুরেফিরে সময় কাটায়। টিকিট বিক্রির একজন অনুমোদিত এজেন্ট থাকলেও বেশির ভাগ টিকিট ইস্যু এবং আর্থিক লেনদেন হয় বিমান ছাড়ার মাত্র এক ঘন্টা আগে সরাসরি বিমানবন্দরে। যাত্রীরা শুধু বুকিং দিয়ে বিমানবন্দরে চলে আসে। ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু আমার অনেক যাত্রীর অভিযোগ, আমি নাকি নিয়মিত হারে ভাড়ার উচ্চমূল্য আদায় করি, অথচ সরকারি খাতায় জমা দেই 'লাস্ট মিনিট' হারে ভাড়ার নিম্নমূল্য। যারা অভিযোগ করেন তাদের উদ্দেশে বলছি- মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে মহাদেশ থেকে মহাদেশে আমি ঘুরে বেড়াই। ছোট হলেও সবাই আমাকে চেনে। প্রবাসে যারা আমার কট্টর সমালোচক, তারাও আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসে। সবাই মনেপ্রাণে চায় আমি বাংলাদেশের গর্ব হয়ে টিকে থাকি। কিন্তু আমার শেকড় তো সুদূর বাংলাদেশে। সেখান থেকে যারা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের সুমতি না হলে আকাশে শান্তির নিড় শুধু কথার কথাই হয়ে থাকবে।

মোঃ ইসমাইল হোসেন (বাবু)
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ
ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

রি ।য়া ।দ

আমরা শুধু মিসকিন

নতুন চাকরি, নতুন জায়গা, নতুন কলিগ, নতুন পরিবেশ সব কিছুই নতুন- ভালো লাগে না। রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে নতুন কোম্পানিতে কাজে যোগদান করেছি। সৌদিয়ানদের সংস্পর্শ এতোদিন পাইনি। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ছিলাম। ছয় বছরে দশটা আরবি শব্দও শিখতে পারিনি। এখন একটু একটু শিখতে হচ্ছে। আগের কোম্পানিতে আমাদের থাকা খাওয়াসহ সব দায়িত্ব ছিল কর্তৃপক্ষের ওপর, এখন থাকা ফ্রি হলেও খাওয়াটা নিজের। নিজে রান্না করতে পারি না। খুব সমস্যায় পড়েছি। রমজান মাস, ক'বেলা না হয় হোটেলেই সেরে নেব। সারা অফিসে যারা মুসলমান আছে তারা বাইরে ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে একই কামরায় মোট পাঁচজন ইন্ডিয়ান, কেরেলার আর আমি একলা। রুমে একটুও শান্তিতে থাকতে পারি না। ওরা একবার কথা শুরু করলে থামানো কঠিন। কি বলে, বুঝে কার সাধ্য। সিলভারের পাতিলে কয়েকটি পাথর নিয়ে নাড়ালে যেমন শব্দ হয়, ওদের কথা ঠিক তেমনি শোনা যায়। তবে ওরা তো কথা বলে না (!) যেন আমার মাথায় এক একটা মুগুরের বাড়ি মারে। এদের মাঝে দু'জন মুসলিম। খুব হিসেবি। সেহ্‌রি খায় হোটেলে আর সন্ধ্যাবেলা এটা-ওটা করে পার করে দেয়। কিন্তু ইফতার করবো কোথায়! চাকরিতে নতুন যোগদান, তিনটা পর্যন্ত ডিউটি হলেও বিকেল ৫টা পর্যন্ত করতে হয়। পাঁচটা দশে ইফতার টাইম। আশপাশে চকবাজারও নেই, ইফতারিও বিক্রি হয় না। কি করি! অবশেষে কেরেলার দু'জন বলল তাদের সঙ্গে মসজিদে ইফতার করতে। দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ছয় বছর ধরে মসজিদে জবরদস্ত ইফতারির কথা শুধু শুনে আসছি কিন্তু কোনোদিন যাইনি। এবার না গিয়ে উপায় নেই। গিয়ে দেখি বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান ও পাকিস্তানি লোকে লোকারণ্য। অন্য দেশীয় যৎসামান্য। লাইন ধরে ইফতারি নিতে হয়। এমতাবস্থায় দু'পা পিছিয়ে গিয়ে এক'পা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেলাম। ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গেলো। বলল- বিদেশে কেউ কাউকে চিনে না, নিজের বাড়িই মনে করো। এক প্যাকেট হাতে নিয়ে মসজিদের ভেতরে লাইনে বসলাম। আজান হলো, সবাই খাচ্ছে আপন মনে। আমিও শুরু করলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। কেউ কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে, আমি খুব লজ্জা পাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম লোকজন উঠে যাচ্ছে। অর্থাৎ খাওয়া শেষ! এতো খাবার খেলো কখন! আমার তো সিকি পরিমাণও শেষ হয়নি। সৌদি ফুড (খেপ্‌ছা), লেবান, আপেল, খেজুর, পাঁপর, কলা, কমলালেবু ইত্যাদি মিলে এক ঝাকা ইফতারি, খেয়ে শেষ করা কঠিন। তার মাঝে লজ্জায় সংকুচিত আমি কি করে দ্রুত শেষ করি। অবশিষ্ট খাবার জায়গায় রেখে ভিড়ের মাঝ দিয়ে চলে এলাম। বাইরে এসে দেখি অনেকেই পলিথিনে করে নিয়ে যাচ্ছে। সেদিনের জন্যে সেরে গেলাম, পরদিন থেকে এক ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না এতো মানুষ প্রতিদিন আল্লার ওয়াস্তে ইফতারি করে, এসব আসে কোথায় থেকে? জানার জন্য পরদিন ওদের সঙ্গে আবার গেলাম। দেখলাম সৌদিয়ানরা দু'হাত মেলে ইফতারি বিলিয়ে দিচ্ছে খুবই শালীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। যতোই ভিড় বা ঠেলাঠেলি হোক না কেন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে যাচ্ছে, কোনো বিরক্তি নেই। তাদের দৃষ্টিতে সবাই সমান, উপরন্তু পুণ্য কামাই। শুধু পার্থক্য আমরা বহিরাগত মানুষ। রোজগারের উদ্দেশ্যে এ দেশে আসা, তাই আমরা নিজদেশে কোটিপতি হলেও এদেশে তাদের ভাষায় মিসকিন। অথচ এই রকম একটি পরিবেশ যদি বাংলাদেশে কোথাও গড়ে উঠতো তাহলে পরদিন নিউজ পেপারের হেডলাইনে আসতো- ইফতারি বা জাকাত নিতে গিয়ে পদপৃষ্ঠে দশজন নিহত ও ৫৪ জন আহত। দানের নামে বাহাদুরি। দোতলা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাকাত দিয়ে নাম কামাতে যায়- হায়রে দানবীর! সে যাই হোক, সৌদিয়ানদের মহত্ব দেখে অবাক হই অথচ এই সৌদিয়ানরাই মাসের পর মাস মাত্র তিনশ' রিয়াল বেতনের কর্মচারীদের বেতন আটকে রাখে। এদের চেনা দায়।

তবে তাদের সালাম দিলে প্রাণটা ভরে যায়। তারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সালাম গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে 'কেফাল হা'ল' (কেমন আছ/আছেন)। অথচ আমরা অপরিচিত মানুষ দেখলে প্রয়োজনে সালাম দিলেও কখনো বলি না 'কেমন আছ/আছেন'। ধনী, শিক্ষিত তথা ভদ্র পরিবারের সৌদিয়ানরা অত্যন্ত অমায়িক। কিন্তু সাধারণ পরিবারের বাচ্চাদের তো শ্বাসনালী দিয়ে শয়তান ঢোকে আর বায়ুপথে বের হয়। রাস্তাঘাটে সাধারণ সৌদিয়ান ছাড়া বাইরের লোকদের দেখলেই উত্ত্যক্ত করে, ঢিল ছোঁড়ে, খোঁচা দিয়ে দৌড় দেয় অথবা সুযোগ পেলে পকেটের টাকাগুলোও হাতিয়ে নেয়। এর জবাব দিলেই পুলিশ নিয়ে আসে। তখন ওদের বিচার না হয়ে আমাদের বিচার হয়। অর্থাৎ সৌদি নাগরিকের বিচার না করে আজনবীর বিচার করে। কারণ ওদের দৃষ্টিতে আমরা শুধুই মিসকিন 'মাইর খাবি কিন্তু কাঁদতে পারবি না'। মানে আমাদের দেশে বাসার চাকরের মতো। তবে ভদ্র অথবা ভালো সৌদিয়ানের নজরে পড়লে অবশ্য সঠিক বিচারই পাওয়া যায়।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
রিয়াদ, সৌদি আরব
E-mail. ayubalibd@hotmail.com